কালের কণ্ঠ

তারিখ 10 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত এও ছিল কপালে!

সেলাই করা খোলা মুখ

মোফাজ্জল করিম

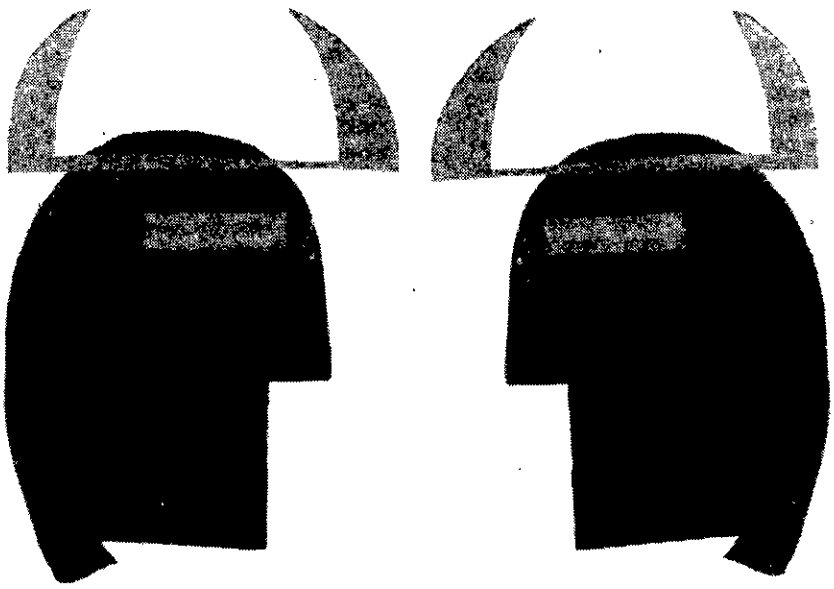

যে শ্রদ্ধার আসনে, যে আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গায় জাতি আপনাদের দেখতে চায়, সেই স্বর্ণোজ্জ্বল আসনটিকে কলুষিত হতে দেবেন না আপনারা। বড় আশা করে একজন দরিদ্র কৃষক তাঁর জমি-জিরাত বন্ধক রেখে অন্ধের যষ্টি ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের জ্ঞান আহরণের জন্য, 'মানুষ' হওয়ার জন্য, মানুষ হয়ে একদিন তাঁর অন্ধকার গৃহকোণকে আলোকিত করার জন্য। তাঁর স্বপ্ন সফল হতে পারে একমাত্র আপনাদের হাত ধরে

ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি, মারামারি, লাঠালাঠি আমাদের দেশে নতুন কিছু না। এগুলো কমবেশি সব যুগে, সব আমলেই হয়ে আসছে। হ্যাঁ, আজকাল না হয় একটু গুণগত পরিবর্তন হয়েছে এই যা। আগে ছাত্রদের মধ্যে মারামারি ছিল বড়জোর ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি পর্যন্ত। তাও বছরে দুই বছরে হঠাৎ কোথাও কোনো দিন কোনো ছাত্র হলে। এর পরে পাকিস্তানি আমলে ষাটের দশকে গভর্নর মোনেম খাঁর সময়ে আমদানি হয় ছুরি-কাঁচি। এখন অবাধে ব্যবহৃত হয় আগ্নেয়াস্ত্র। আগে ছাত্ররা ঝগড়া-ফ্যাসাদ করত নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান নানা ইস্যু নিয়ে। সেগুলো ছিল ছাত্ররাজনীতি বিষয়ক। অথবা ছাত্রস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে। এখনকার বিবাদের মাত্রা ভিন্ন। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে এখন একীভূত হয়ে গেছে ছাত্ররাজনীতি।

ইদানীং ছাত্রদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে মনে হয়। এটা খুবই শুভলক্ষণ। সাধারণ মানুষ তাদের সন্তান কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বিপথগামী হোক, এটা কোনো দিন চায় না। একটা সুষ্ঠু, সুন্দর পরিবেশ দেশের সব ক'টি বিদ্যালয়ে বিরাজ করুক, এটাই সবার প্রত্যাশা।

দুই.

ছাত্ররা মারামারি করছে না, (হয়ত) পড়াশোনায় মনোযোগী হচ্ছে, অকারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে না—এটা বোধ হয় ছাত্রদের গুরুমহাশয়দের কারো কারো ভালো লাগেনি। তাঁরা আসর গরম করার জন্য নিজেরাই এবার ময়দানে নেমে গেলেন। এমনটিই দেখলাম আমরা পত্রপত্রিকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নানা রঙে রঞ্জিত' (বেনীআসহকলা) দলগুলোর একটি দলের শিক্ষকরা নাকি সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে কিলাকিলি-ঘুষাঘুষি, এমনকি চেয়ার ছোড়াছুড়ি পর্যন্ত করেছেন। দু-একজন শিক্ষক এতে আহতও হয়েছেন। একজনের নাকি নাক ফেটে রক্তপাতও হয়েছে। ঘটনাস্থল ছিল টিএসসির একটি সভাকক্ষ। সেখানে শিক্ষকদের এই হৈ-হুল্লুহুলে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের ছাত্ররা ছুটে আসে। তারা নিশ্চয়ই তাঁদের এই রণমূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে। নাকি লজ্জায় মুখ ঢেকে সেখান থেকে সরে পড়ে। ছাত্ররা হয়ত ভাবছিল, স্যাররা বিদ্যার জাহাজ, কিন্তু তাঁরা রণবিদ্যায়ও যে পারদর্শী তা তো জানা ছিল না।

পত্রিকা মারফত যা জানা যায় তাতে মনে হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও কোনো কোনো সিনিয়র শিক্ষকও এই লজ্জাজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কারো কারো নামও এসেছে পত্রপত্রিকায়। এসব প্রতিবেদনের কোনো প্রতিবাদও চোখে পড়েনি কোথাও। আর প্রতিবাদ হবে কিভাবে। ঘটনা যখন ঘটেছে সর্বসমক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে, তখন তা অস্বীকার করার উপায় কোথায়? যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, যাঁরা হাতাহাতি-মারামারির মত একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটালেন, তাঁরা কি একবারও তাঁদের নিজের মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা, সর্বোপরি দেশের এই ঐতিহ্যবাহী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানটির সুনামের কথা ভেবে দেখলেন না? এমনিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা কলঙ্কময় দিক আজ সমগ্র জাতিকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে—নিয়োগ-বাণিজ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় নম্বর কমবেশি করা, ভুয়া ডিগ্রি, মিথ্যা সার্টিফিকেট, নারী কেলেঙ্কারি—কী নেই আজ শিক্ষাঙ্গনে। বাকি ছিল শুধু প্রকাশ্য সভায় শিক্ষকদের মারামারি, এখন সেটিও ঘটে যাওয়ায় কলঙ্কের ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে গেল বলা যায়। আজ যদি কোনো অভিভাবক প্রশ্ন তোলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে বা মেয়েকে কী শিখতে পাঠাব? দলাদলি? কোন্দল? মারামারি? অন্য সব কেলেঙ্কারি? তখন কী জবাব দেবেন আপনারা? এই বিশ্ববিদ্যালয়েই এখনো অনেক নমস্য শিক্ষক আছেন, অনেকে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণের পর এখন নীরবে এই সব অনাচার দেখে চলেছেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন তো সামান্য পদের জন্য, কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে একটু করুণা লাভের আশায় এই যে নোংরামিতে ডুবিয়ে দিচ্ছেন এত বড় একটা ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠকে, তার কি কোনো নজির আছে সারা বিশ্বে কোথাও? আজকাল তো আধুনিক প্রযুক্তি, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির কল্যাণে মুহূর্তেই সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে পড়েছে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছেন। এ ধরনের খবর কি এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের বিবেককে একটুও নাড়া দেয় না? তাঁদের ছাত্ররা যদি তাঁদের বলে, স্যার, ফেসবুকে আপনাদের মারামারি নিয়ে অনেক মন্তব্য এসেছে, তখন কী জবাব দেবেন তাঁরা?

অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই যে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য দায়ী তা নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষকের জন্য পুরো শিক্ষকসমাজকে কলঙ্কের ভাগী হতে হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকরা এসব অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন না। কারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা খুবই শক্তিশালী, তারা প্রায়শই কর্তৃপক্ষের মদদপুষ্ট। যেসব ছাত্র ছাত্ররাজনীতি করে, তারা অনেক সময় কোনো ইস্যু নিয়ে একই দলের হওয়া সত্ত্বেও নিজ দলের সদস্যদের ওপর চড়াও হয়। এটা তো হরহামেশা হচ্ছে। কিন্তু একই দলের শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন, আচরণ করছেন ছাত্রদের মতো, এটা আগে দেখা যায়নি। এটা অকল্পনীয়। এখন যদি ছেলেরা এ ব্যাপারে তাঁদের তালিম দিতে চায়, তাহলে কী বলবেন? কথাগুলো বলছি বড় দুঃখে। আমরা অবশ্যই চাই না আমাদের শিক্ষক, আমাদের গৌরব, আমাদের অহঙ্কার, সমাজে কোনো অবস্থায় নিগৃহীত হোন, হেয় প্রতিপন্ন হোন কারো দ্বারা—তা সে সরকার-বেসরকার, সমাজপতি-ক্রোড়পতি যেই হোন না কেন। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষা করতে ততটুকু সোচ্চার, যতটুকু তারা তাদের মাতা-পিতার সম্ভ্রম রক্ষার্থে সক্রিয়। কিন্তু শিক্ষকরা যদি নিজেদের সম্মান নিজেরাই এভাবে খুইয়ে বসেন, তাহলে আর কী বাকি রইল। এরপর তাঁরা মাথা উঁচু করে কোন আদর্শের কথা, নীতির কথা, প্ল্যাটো-সক্রেটিসের কথা, কোন নৈতিক অবস্থান থেকে তাঁদের শিক্ষার্থীদের বলবেন?

তিন.

এখন সমাজের অবক্ষয় এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে আমরা অনেক কিছুই আর দেখেও দেখি না। অনেক কিছু এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। সমাজে অন্যায়-অবিচার-অনাচার এত বেড়ে গেছে যে মানুষ প্রতিবাদ করারও আর প্রয়োজন বোধ করে না। আমাদের চারপাশে রোজ যে খুন-জখম-রাহাজানি, ধর্ষণ, অপহরণ-লুণ্ঠন চলছে, যার রগরগে বিবরণ রোজ খবরের কাগজের পাতায় আমরা পাঠ করছি, তা আমাদের অনুভূতিগুলোকে ক্রমেই ভোঁতা করে ফেলছে। আগে সামান্য একটু অশালীন আচরণের জন্য, এক শ টাকা ঘুষ খাওয়ার জন্য, কেউ কাউকে জনসমক্ষে কোনো কটু-কাটব্য করার কারণে বা কোনো মহিলার প্রতি অশোভন আচরণ করলে রীতিমত হৈচৈ পড়ে যেত। আর এখন গড়ে উঠেছে দেখেও না দেখার সংস্কৃতি। এখনকার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে : থাক বাবা, ওদের যা খুশি করুক, আমি ওতে নাক গলাতে গিয়ে আবার কোন না কোন বিপদে পড়ি। ফলে সমাজে অন্যায় ও অশোভন আচরণ ও সেই সঙ্গে নানাবিধ অপরাধ বেড়ে চলেছে অবাধে। সেই সঙ্গে চলছে বিচারহীনতার ও প্রতিকারহীনতার এক অভূতপূর্ব অপসংস্কৃতি। এখন একজন শিক্ষককে কোনো মহাপ্রভু জনসমক্ষে কান ধরে উঠবোস করালেও তার বিচার হয় না। কল্পনা করা যায়?...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মারামারির ঘটনার পর এরূপ অনাচার কি আরও বৃদ্ধি পাবে না? কিন্তু সাধারণ মানুষ, যাদের আমরা বলি নিরীহ পাবলিক, তারা তো এটা চায় না। অথচ সমাজে তাদের সংখ্যাই শতকরা নব্বইয়েরও বেশি।

বয়সের কারণে, শিক্ষার অভাবে ছাত্রছাত্রী কিংবা সাধারণ মানুষ অনেক দুষ্কর্মে লিপ্ত হতে পারে; কিন্তু উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের আলোকিত মানুষ, যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন অন্যকে আলো দান করার, তাঁরা যদি জনসমক্ষে হাতাহাতি-মারামারির মত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হন, তাহলে আমরা জাতির বিবেককে পাব কোথায়? জাতি তো এখনো মনে করে, দুর্যোগে-সঙ্কটে, বিপদে-আপদে যদি কারো কাছ থেকে নির্ভেজাল সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়ার আশা করা যায়, তবে তাঁরা আমাদের জ্ঞানতাপস শিক্ষকসমাজ। এই কলহপ্রিয় শতধাবিভক্ত সমাজে একমাত্র তাঁরাই পারেন তাঁদের মেধা, প্রজ্ঞা ও সততা দিয়ে জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। আমাদের রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা—সবই আজ যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে আমাদের সৎ ও সাহসী নেতৃত্ব গড়ে তোলার কারিগরদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি হবে, সেটাই স্বাভাবিক। টিএসসির ঘটনা আমাদের দারুণভাবে আশাহত করেছে, এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

বন্ধুমহলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সময় আমার এক বন্ধু সেদিন বললেন, ব্যাপারটি নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? না হয় একটু মারামারিই করেছেন শিক্ষকরা। তাঁরাও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাঁদের কি রাগঝাল থাকতে নেই? তাঁরা কি ফেরেশতা? আরেক বন্ধু জবাব দিলেন : তাঁরা ফেরেশতা না ঠিকই, কিন্তু শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশা, তাঁরা হবেন ফেরেশতাতুল্য চরিত্রের মানুষ। তাঁদের কোনো নৈতিক স্খলনের কথা শুনলে আমাদের কষ্ট লাগে। তাঁরা যেখানে নিজেদের উৎসর্গ করার কথা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে, তাদের চরিত্র গঠনের কাজে; সেখানে তাঁরা নিজেরাই যদি জড়িয়ে পড়েন এরূপ অন্যায় আচরণে, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে কী? বলেই তিনি উদাহরণ দিলেন আমাদের সময়ের ঋষিতুল্য অধ্যাপক জি. সি. দেব, ডক্টর ইশ্রাস আলী, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, শহীদ মুনীর চৌধুরী, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখের, যাঁরা আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিলেন জ্ঞানসাধনায় ও শিক্ষার্থীদের আলোর পথের সন্ধান দিতে। তখনও দেশে রাজনীতি ছিল, শিক্ষকদের মধ্যেও রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল; কিন্তু সেগুলো ছিল তাঁদের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে বচসা-কলহ তো দূরের কথা, আলোচনা করতেও দেখা যেত না তাঁদের। আর রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি? নৈব, নৈব চ।

চার.

আজকের প্রসঙ্গটি নিয়ে লিখতে বসে বারবার ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মন। আমি জানি, অনেকেরই হয়ত ভালো লাগছে না এসব কথা। আমি শুধু বলতে চাই, কোনো শ্রেণি-গোষ্ঠী-পেশা বা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলছি না। আমার একমাত্র নিবেদন, যে শ্রদ্ধার আসনে, যে আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গায় জাতি আপনাদের দেখতে চায়, সেই স্বর্ণোজ্জ্বল আসনটিকে কলুষিত হতে দেবেন না আপনারা। বড় আশা করে একজন দরিদ্র কৃষক তাঁর জমি-জিরাত বন্ধক রেখে অন্ধের যষ্টি ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের জ্ঞান আহরণের জন্য, 'মানুষ' হওয়ার জন্য, মানুষ হয়ে একদিন তাঁর অন্ধকার গৃহকোণকে আলোকিত করার জন্য। তাঁর স্বপ্ন সফল হতে পারে একমাত্র আপনাদের হাত ধরে। আপনারা সেই কৃষক, সেই দিনমজুর, সেই বিধবার ধনটিকে আলোর সন্ধান দিন। দোহাই আপনাদের, অন্ধকারে ঠেলে দেবেন না তাকে।

আর আমার এই আর্তি প্রকাশের ধৃষ্টতাটুকু আপনারা মহৎপ্রাণ, গুণীজন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন—এটাই একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে সবিনয় নিবেদন আপনাদের কাছে। হৃদয়ের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা আকুতিটুকুকে ভুল বুঝবেন না, প্লিজ!

লেখক : সাবেক সচিব, কবি
mkarim06@yahoo.com